Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
UGC Enlisted Serial No. 48666
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 28-32
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রলয় নাগের 'কাকতাড়ুয়ার গল্প' : একটি নিবিড় পাঠ

ড. সূপেন্দ্র নাথ রায়
সহকারী অধ্যাপক, রবীন্দ্রসদন মহিলা মহাবিদ্যালয়, করিমগঞ্জ

Abstract

Praloy Nag is an emerging writer in the genre of Bengali short story. He reflects the various aspects of our society –unemployment, caste–discrimination etc. in his story. We find the subaltern class in all his stories as the writer himself is born in a lower class family. After reading his story the readers feel that his characters do not abide by the conventional rules of the society. As for example, Mahamaya, a character rejects her Hindu culture. She does not use 'Sidur' as a mark of protest although she has her husband. Mahuya, another character indulges in free sex with a neighbor although she has a husband like Mahamaya. On the other hand, Praloy Nag, the writer also reflects the influx of the Hindus to India from Bangladesh. The writer uses the languages character wise. Nag has not controlled his character as a creator. He deeply observes our society. Actual, Praloy is a different kind of writer which can be felt when the readers deeply read his story.

(ক)

২০০৮ সালে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় গল্পকার প্রলয় নাগের (১৯৮৮) সঙ্গে প্রথম দেখা হয় প্রবন্ধকারের। তখন এই দুই ব্যক্তিই আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নিয়ে পড়াশুনা করতেন। তারপর ২০১৫ – এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁরা একই সঙ্গে থেকেছেন, পড়াশুনা করেছেন। বিশেষ করে পি. এইচ. ডি। চলাকালীন গল্পকারের সঙ্গে প্রাবন্ধিকের এক গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রাবন্ধিকের কাছে প্রলয় নাগ আলাভোলা ধরণের মানুষ। তিনি কখন কী করতেন তার ঠিক ছিল না। বাড়ির অবস্থা তাঁর মোটেই ভালো নয়। তবু তিনি শখ-আনন্দ করতে পিছপা হতেন না। একদিন দেখা গেল ফেলোশিপের টাকা দিয়ে তিনি শিলচর থেকে গিটার কিনে আনলেন। এবং যখন তখন গলা ফাটিয়ে গান গাইতে লাগলেন – "দে দে পাল তুলে দে, মাঝি হেলা করিস না....।" নাগ যে বাড়িতে থাকতেন, তার পাশের বাড়ির লোকেরা নাগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন। বাড়িওয়ালাও তাঁর অত্যাচার মুখ ভার করে সহ্য করতেন। কারণ নাগের কাছ থেকে তারা মাস গেলেই ১২০০ টাকা পেতেন। অনেক মানুষ আছেন বাইরে একরকম আর ভেতরে অন্যরকম। কিন্তু নাগ বাইরে – ভেতরে একই রকম। তিনি জীবনকে জীবনের মতো চলতে দিতেন না। বরং নিজের মতো করে তিনি জীবনকে চালাতেন। আর দশ জনের মতো তিনি প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-কানুন মেনে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন না। এটি সাধারণত খুব কম মানুষই পারতেন। কোনোদিন পুরানো বাংলা বিভাগের গাছের ডালে বসে তিনি গলা ছড়িয়ে দিয়ে গান গাইতেন। কোনোদিন বিভাগে চিৎকার করে বই পড়তেন। একদিন চিৎকার করে বই পড়তে গিয়ে গান গাইতেন। কোনোদিন বিভাগে চিৎকার করে বই পড়তেন। একদিন চিৎকার করে বই পড়তে গিয়ে এক বন্ধু নাগের নাকে সজোরে ঘুষি মারে। ঘুষি খেয়ে ক্রন্দন করতে করতে নাগ বিভাগীয় প্রধান ড.

বেলা দাসকে নালিশও জানান। কোনোদিন তিনি চপ্পল পড়ে কাঠের লম্বা দাঁড়িওয়ালা বিশাল ছাতা নিয়ে বিভাগে আসতেন। আবার কোনোদিন হঠাৎ মাথা নেড়া করে তিনি বিভাগে আসতেন। একদিন বিভাগের অনুষ্ঠানে তিনি বাল্বের টুকরো খেয়ে কৌশলও দেখালেন। এই হচ্ছে ব্যক্তি প্রলয় নাগের জীবন। গল্পকারের এইসব টুকরো জীবন-কথা তুলে ধরলাম একারণেই যে, তাঁর সাহিত্যে হাতেখড়ি হয়। প্রথম লেখেন 'পরিবর্তন' নামে একটি নাটক। তারপর একে একে গল্প। এখানে বলে রাখা ভালো যে, তাঁর 'পরিবর্তন' নাটকটি এবং 'কাকতাড়ুয়ার গল্প' গ্রন্থের প্রায় অধিকাংশ গল্পই আসাম বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন আইরংমারা গ্রামের ভাড়া বাড়িতে বসেই রচনা করেন। লেখার ভূত তাঁর মাথার ভর করলেই তিনি প্রবন্ধকারকে বলতেন, "সূপেন, কাকতাড়ুয়া নামে এক্খান গল্প লিখতাছি। আয় দেইখ্যা যা।"

(খ)

কলকাতার একুশ শতক প্রকাশনী থেকে প্রলয় নাগের যে 'কাকতাড়ুয়ার গল্প' (জানুয়ারি ২০১৮) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, তাতে গল্পগুলিকে সময়কাল অনুযায়ী সাজানো হয় নি। এখানে তাঁর গল্পগুলিকে সময়কাল অনুযায়ী সাজানোর চেষ্টা করা হল - 'মহামায়া মিষ্টান্ন ভান্ডার' (২০১৪), 'ডুয়ার্সের কোলে' (২০১৪), 'অনুপ্রবেশ' (২০১৪) 'মহুয়ার গল্প' (?), 'ভুটান রাজার মুখ' (?), 'শিমুলতুলো' (২০১৫), 'কাকতাড়ুয়ার গল্প- ১' (?), 'কাকতাড়ুয়ার গল্প- ২ (?), 'কাকতাড়ুয়ার গল্প- ৩' (২০১৫), 'কাকতাড়ুয়ার গল্প- ৪' (২০১৫), 'কাকতাড়ুয়ার গল্প- ৫' (২০১৫), 'ফড়িং' (২০১৭)। এমন স্রষ্টা খুব কমই আছেন যাঁরা প্রাতিষ্ঠানিকতার মাথায় মূত্র বিসর্জন করেছেন। প্রলয় নাগ তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন। স্বামী নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানটিকে গল্পকার প্রলয় নাগ ভেঙে চুরমার করে দেন তাঁর 'মহামায়া মিষ্টান্ন ভান্ডার' গল্পে। আবার এই বিপ্লবী মহামায়ারা যখন গ্রাম থেকে উঠে আসে তখন সত্যিই আমরা ভেবে বিস্ময় প্রকাশ করি ! স্বামী থাকা সত্ত্বেও মহামায়া স্বামীত্বের চিহ্ন ব্যবহার করে না। সে হাতে শাঁখা পড়ে না। কপালে সিঁদুরও দেয় না। প্রলয় নাগ দেখালেন প্রথমে নিজেকে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর বাকীদের। তাই মহামায়া প্রথমে নিজেই প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে। তারপর মা-কেও ভাঙতে সাহস যোগায় - "ঠাইস্যা মাছ-মাংস খাও। তুমি মরলে কি বাবা মাছ-মাংস খাওয়া ছাড়তে? তুমি ছাড়বা ক্যান্?"[১] প্রেম যে নিঃস্বার্থ হয়, এর মধ্যে যে কোনো ধরণের নোংরামো থাকে না - এই দিকটিও গল্পকার নাগ এখানে দেখান। সেইসঙ্গে গল্পকার আলোচ্য গল্পটিকে সুকৌশলে আবেগ দিয়ে পণ প্রথার বিরোধীতাও করেন। আবেগ যে পণপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করার একটি হাতিয়ার হতে পারে তা প্রলয় নাগ এখানে দেখালেন। অন্য লেখকদের থেকে তাঁর জাত যে আলাদা তিনি রা প্রমাণ করলেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বিয়ের পর মেয়েরা সাধারণত স্বামীর বাড়িতেই যায়। এতদিনের পরিচিত ভিটেমাটি ছেড়ে তাদের যেতে হয় অপরিচিত এক জায়গায়। এক্ষেত্রে মরার ওপর কেউ যদি খাড়া মারে অর্থাৎ, জন্মভিটে ছাড়ব আবার পণও দেব ! এখানে কিভাবে প্রতিবাদ করবো? এটি খুব গভীরভাবে ভেবেছেন গল্পকার নাগ। "পণ নেবেনও না, দেবেনও না" - এভাবে অনেক প্রতিবাদ হয়েছে। কাজ কিছুই হয়নি। নাগ এখানে নব দিশা দেখালেন। হাতিয়ার করলেন আবেগকে। মহামায়ার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করালেন সেই অমোঘ বাণী - "আমারেও নিবা আবার টেহাও নিবা। তাহলে পীরিত করছিলা কোন্ দুঃখে?"[২] 'মহুয়ার গল্প' -এ মহুয়াকে দিয়ে আর একভাবে সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানটির মুখে চুনকালি দেন গল্পকার প্রলয় নাগ। মহুয়ার শরীরের সুখ যখন স্বামী মেটাতে পারে না, তখন মহুয়া বাধ্য হয় পরপুরুষ নামক প্রতিষ্ঠান- বিরোধী শব্দটিকে আঁকড়ে ধরতে। সে বিন্দাস মুডে নিবারণ কবিরাজের বিছানায় শুয়ে আপন শরীরের পিপাসা চরিতার্থ করে আসে।

(গ)

মোট ৯টি পলকে বিভক্ত 'অনুপ্রবেশ' গল্পটিতে গল্পকার বাংলাদেশে অবস্থিত হিন্দু বাঙালিদের এক করুণ জীবন-চিত্র তুলে ধরেন। দুই নৌকায় পা দিয়ে চলা মানুষের জীবনের মতো বাংলাদেশে অবস্থিত হিন্দু বাঙালিদের জীবন।

মুসলমানদের অত্যাচারে না পারে এরা বাংলাদেশে থাকতে, না পারে ভারতে আসতে। কারণ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে। পার হলেই গুলি গিলতে হবে। ১৯৪৭- এর আগ থেকে, তারপর থেকে এবং আজও মুসলিমদের অত্যাচারে হিন্দু বাঙালিরা যে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আসতে বাধ্য হচ্ছে এই গল্পটিই তার প্রমাণ। তা না হলে কেন গল্পকার এমন গল্প লিখবেন? কিন্তু দুলালের মা বাংলাদেশেই থেকে যান। কারণ প্রাণের চেয়ে তার কাছে জন্মভিটের টান অধিক। তিনি হিন্দু-মুসলমান বোঝেন না। বোঝেন তার জন্মভিটেকে - "কেডা কইল এইডা মুসুরমানের দ্যাশ? আমার জন্ম এই দ্যাশে।"[৩] এই চরিত্রটি প্রলয় নাগের এক শ্রেষ্ঠ নির্মাণ। এভাবেও যে মানুষ ভাবতে পারে প্রলয় নাগ তার প্রমাণ দিলেন। গল্পকার আরও চমক দেখান গল্পের শেষে এসে। বাংলাদেশ থেকে ভারতে পালিয়ে আসা ছেলে গোপালের উদ্দেশ্যে মা সংশয় বাক্য ছুঁড়ে দেন, "দেহিস, সাবধানে থাহিস ! তগরে আবার যাতে বাংলাদেশি কইয়া খেদাইয়া না দেয়।"[৪] এ এক অতি জীবন্ত বচন। ভারতে এসে সত্যিই কি তারা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবে? না কী তাদের বিদেশি বলে বিদায় করে দেওয়া হবে? কী হবে তাদের পরিচয়? কোন্‌টি হবে তাদের দেশ? কোন্‌টি হবে তাদের কূল? তাহলে কি ফজলুর রহমান বাবু ঠিক গানটিই গেয়েছেন -

"সামনে নদী ডাইনে - বায়ে দুই পাশে দুই কূল।
আমি কোন্ কূলেতে পাড়ি দেব কোন্‌টা আমার কূল?"

মোদ্দাকথা, অনিশ্চিত তাদের ভবিষ্যৎ জীবন। তাই গোপালের মা সন্তানের অস্পষ্ট শরীরটিই দেখতে পান - "চোখ মুছতেই আবার গোপালের অস্পষ্ট শরীরটা চোখে পড়ল।"[৫]

(ঘ)

কাকতাড়ুয়া নামে গল্প সিরিজের প্রথম গল্প 'কাকতাড়ুয়ার গল্প- ১' - এ গল্পকার প্রলয় নাগ এক ক্ষয়িষ্ণু ভঙ্গুর, মূল্যবোধহীন সমাজের কথা তুলে ধরেন। তা না হলে কেন গল্পকার বিখ্যাত ভাওয়াইয়া সংগীতকার আব্বাস উদ্দিনের সামাঙ্কিত সেতুর নিচে যুবতীর লাশ খুঁজে পাবেন? আবার কেউই বা সেই গন্ধযুক্ত লাশকে দেখে যুবক-ছোকরারা বলবে - "মালটা খাসা ছিল রে।"[৬] গল্পটি পাঠ করে এই প্রশ্নগুলি উঠে আসে যে, গুমঘর থেকে কেন বারবার মরা লাশ উধাও হয়ে যাচ্ছে? কেন নদীতে আবার যুবতীর লাশ পাওয়া যাবে? কেন যুবতীর লাশটিকে যততত্র সবাই দেখতে পাবে? তখন আমাদের বুঝে নিতে হবে যে, মরা আর মরা নয় মরা রূপান্তরিত হয়েছে সংকেতে কিংবা রূপকে। এ মরা একবিংশ শতকের বেকারত্বের সংকেত, আবার বেঁচে থাকারও রূপক। যে শতকে বেকার যুবক-যুবতীরা অনবরত আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। তাই নদীতে বারবার মরার লাশ উদ্ধার হয়। আবার এই মরাটিকে কেউ যখন এলআইসি অফিসে টাকা জমা দিতে দেখেন তখন তা বেঁচে থাকার রূপকে পরিণত হয়ে যায়। 'কাকতাড়ুয়ার গল্প- ৩' -তেও গল্পকার আমাদের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের অত্যন্ত জ্বলজ্যান্ত পরিচিত একটি দিকের চিত্র তুলে ধরেন। যে সমাজে প্রতিদিন শ্বশুররা শ্বশুর থেকে স্বামীতে রূপান্তরিত হন। 'কাকতাড়ুয়ার গল্প- ৪' গল্পটিকে নাগ সভ্য সমাজের আর একটি পরিচিত জঘন্য দিকের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। যে সভ্য সমাজে জাতপাতের দোহাই দিয়ে দাহকার্য সম্পন্ন করা মানুষটির পুনরায় খড় দিয়ে মানুষ বানিয়ে সাহকার্য করে শ্রাদ্ধাশান্তির ব্যবস্থা করা হয়। তা না হলে যে চামার কেষ্টর পিতার শ্রাদ্ধে সমাজের উচ্চ জাতেরা আসবে না ! সভ্য সমাজের এই জঘন্য মানসিকতাকে কেষ্ট গালি দিয়ে দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়ে নেয়- "মানুষ শালা শকুনের থেইক্যাও অধম। শকুনের একটা বিবেক বইল্যা কিছু আছে, শালা মাইনসের নাই।"[৭]

(ঙ)

'ডুয়ার্সের কোলে' গল্পটি প্রলয় নাগ আত্মকথন ভঙ্গিতে লেখেন। এই গল্পের নায়ক স্বয়ং গল্পকার ছাড়া আর কেউই নন। কারণ গল্পকার বাস্তব জীবনে এমন চরিত্রেরই একজন মানুষ। তিনি যে হুট করে বেরিয়ে পড়ারই মানুষ

এটি প্রবন্ধকারের সম্পর্ণরূপে জানা। তাঁর এই গল্পগ্রন্থের ১২টি গল্পের মধ্যে 'ডুয়ার্সের কোলে' গল্পটি পাঠ করলে 'ব্যক্তি' প্রলয় নাগকে চেনা সহজ হয়। 'ব্যক্তি' প্রলয় নাগকে চেনা যায় আর একটি গল্প পাঠ করে। সেটি হল 'কাকতাড়ুয়ার গল্প- ২' গল্পটির শেষে দেখা যায় কাকতাড়ুয়া গলা ছেড়ে দিয়ে গান গাইছে। ব্যক্তি জীবনে প্রলয় নাগও যে সত্যিই গলা ছেড়ে দিয়ে গান গাইতেন সেটি পূর্বেই বলা হয়েছে।

(চ)

গল্পকার প্রলয় নাগের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি। সমাজকে তিনি যে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তার প্রমাণ তিনি গল্পে দিয়েছেন। যেমন – ঠান্ডা চা-ইয়ের রং যে কালো হয় – এটি আমরা পর্যবেক্ষণ না করলেও গল্পকার নাগ তা করেছেন। যতীন বলে – "ঠান্ডা চা গরম করলে কি আর আগের স্বাদ থাহে। রংডাও কালা হইয়া যায়।"[৮] কিংবা কাঁচা রাস্তার মাঝখানে যে কোনো ঘাস জন্মায় না এবং ওই পরিষ্কার পথটি দিয়েই যে মানুষ বেশি চলাচল করে তাও গল্পকারের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। গল্পকার লেখেন- "কাঁচা রাস্তার আরও একটা ধর্ম আছে। কাঁচা রাস্তার মাঝখানে কোনো ঘাস জন্মায় না, জন্মাতেও পারে না। কাতণ ওই মাঝখানটা দিয়েই লোকজন বেশি চলাচল করে"[৯]

(ছ)

প্রলয় নাগ তাঁর গল্পগুলিকে বঙ্গালি ভাষায় পরিবেশন করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, যার মুখে যেমন ভাষা মানায় তার মুখে তিনি সেই ভাষাই বসিয়ে দিয়েছেন। নিষিদ্ধ পল্লির বাসিন্দাদের মুখে তিনি নিষিদ্ধ ভাষা বসিয়েছেন আর চামারের মুখে চামারের ভাষা। এতে করে তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে তিনি কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠানের কাছে মাথা নত করেননি। খুব কম লেখকই আছেন, যারা এই ধরণের কাজ করতে পারেন। প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ভাষা কিভাবে গল্পকার ব্যবহার করেছেন তার দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

১. "কমজ্জাত মাগি, তুই লাই দিয়া
ছ্যাড়ারে বদ্মাস বানাইস।" [১০]
২. "তুই হইলি শালি অলক্ষ্মী মাগি।" [১১]
৩. "কি বালছাল ল্যাকছস এগুলো।" [১২]

১৯৮৮ সালে গল্পকার প্রলয় নাগের জন্ম। এ পর্যন্ত তিনি জীবনকে যেভাবে পেয়েছেন ও দেখেছেন ঠিক সেভাবেই সাহিত্য নির্মাণ করেছেন। নিবিড় পাঠে মনে হয় গল্পের জন্য তিনি গল্প লেখননি। বরং জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে গিয়েই তিনি গল্প লিখেছেন। ব্যক্তি জীবনে যেভাবে তিনি অবাধ বিচরণ করতেন, তাঁর গল্পের চরিত্ররাও অবোধে বিচরণ করে। স্রষ্টা হয়েও উড়ার সুতো তিনি নিজের কাছে রাখেননি। রেখে দিয়েছেন তাঁর চরিত্রদের কাছে। আর এখানেই তিনি অনন্য ও স্বতন্ত্র।

সূত্রনির্দেশ:

১. নাগ, প্রলয় : কাকতাড়ুয়ার গল্প, একুশ শতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ – জানুয়ারি ২০১৮, পৃ- ৩৪।
২. তদেব, পৃ- ৩৭/
৩. তদেব, পৃ- ৫৮/

৪. তদেব, পৃ- ৬১/
৫. তদেব, পৃ- ৬২/
৬. তদেব, পৃ- ৭১।
৭. তদেব, পৃ- ৮৩।
৮. তদেব, পৃ- ৩৫।
৯. তদেব, পৃ- ৬৩।
১০. তদেব, পৃ- ১৯।
১১. তদেব, পৃ- ৮২।
১২. তদেব, পৃ- ৮৭।